মেডিকেলে কয়েকবার পরীক্ষা দেয়া, হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে পড়া যেন ডাক্তার হওয়ারই একটা শর্ত। কিন্তু ঋতিতো সেই ফার্স্ট হওয়া স্টুডেন্ট; তার জন্য এটি মানানসই নয়। এরিমধ্যে একটা ভাইফোঁটার দিন চলে এসেছে–বাবা-মা কিছুতেই সেকথা বুঝতে দিতে চায় না। কিন্তু ঋতি নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়েছে। নিয়ম করেই ঋভুর জন্য প্যান্ট-শার্ট কিনলো বাবাকে নিয়ে। দিনটিতে কোথাও গেলো না। সেই সকাল থেকেই ঋভুর ছবির দিকে অনিমেখ তাকিয়ে ছিলো, অনিঃশেষ সে চাহনি। ঋভুর ছবিতে আজও ভাইফোঁটা দিলো সে। আর দিনটা একরকম কেঁদে-কেঁদেই কাটিয়ে দিলো।

আরও একটু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ঋতি মিত্রকে। ফাইনাল ইয়ারের বেশকিছু ক্লাশ মিস দিলেও এখন কিছুটা রেগুলার হয়েছে। মাকে আর ক্লাশের সামনে বারান্দায় বসতে দেখা যায় না–তবে রাতে হোস্টেলে থাকলে মা সঙ্গে আছেনই। দু'জন বান্ধবী ঋতির কারণে পরীক্ষা ড্রপ দিয়েছে–এমন ঘটনা ভূ-ভারতেও বিরল–মেডিসিনের স্যার শুনেই বললেন সেকথা।

নানা কারণে ওদের পরীক্ষাও পিছিয়ে যায়। এখনও ক্লাশ চলছে ফিফথ ইয়ারের। এরিমধ্যে আরও একটা ভাইফোঁটার দিন চলে আসে। পুজোর পরপরই দিনটা–কাউকে মনে করিয়ে দিতে হয় না। এখন পুরোদস্তর ঠিক হয়ে গেছে ঋতি; কিন্তু বড্ডো চুপচাপ–কী প্রাণোচ্ছল আর হাসিখুশি মেয়েটা ভ্রাতৃহীনতায় কেমন অন্তর্মুখীন হয়ে পড়েছে!

মাকে এখন আর হোস্টেলে সবদিন থাকতে হয় না। কী একটা পরীক্ষা আছে পরশু। কাল আবার ছুটিরদিন। পরীক্ষাটার জন্য আজ ও কাল রাতটা পাওয়া যাবে। পরীক্ষার জন্যই ঋতি সেদিন হোস্টেলে এসেছে। মাও আসতে চেয়েছিলেন–বাবার জ্বর বলে মেয়েই মাকে আসতে দেয়নি। আজ আবার রুমমেট অপলা নেই–কাজিনের হলুদের অনুষ্ঠানে উত্তরা গেছে। বাসা থেকে আসার পর মা- মেয়ের কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে। রাতের শেষ ফোনটা মাই-ই করেছিলো।

– পড়ছিস মা।
– এই হচ্ছে একটু-একটু।
– খেয়েছিস ঠিকঠাক মতো।
– খেয়েছি মা। বাবার জ্বর কেমন?
– মনে হয় জ্বরটা এখন অনেক কম। বেশি রাত জাগিস নারে মা।
– বাবা কি ঘুমিয়ে পড়েছে মা।
– না, টিভির দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বলবি?

এরপর বাবার সঙ্গেও কথা হয়।

– জ্বর আছে বাবা?
– না, মা। জ্বরটা নেমে গেছে–ডাক্তার মেয়ের বাবার জ্বর কী বেশিদিন থাকতে পারে রে!

ঋতি হাসে। বলে–জ্বর না থাকলে প্যারাসিটামল খাবে না। আর কালকে আনারস খেয়ে নিও। ভাইরাস জ্বরে এরকম একটু ভোগাবেই বাবা।

– ঠিক আছে মা, তুমি বেশি রাত জেগো না মা।

কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর থেকেই কালো একটা ডায়েরিতে কীসব লিখে আসছে ঋতি। সেটা আবার কারও সামনে নয়, কাউকে দেখতেও দেয় না সেটি। বরং লুকিয়ে রাখে, লুকিয়ে লেখে। অপলাই কেবল একদিন ডায়েরিটা একবার দেখেছিলো। ঋতি কেমন যেন ছটফট করছে আজ–কোথাও বেশি সময়ের জন্য থিতু হতে পারছে না। অপলা নীহারকে রিং করে বলেছে–অবশ্যই ঋতির সঙ্গে রাতে ঘুমাবি, ও যেন একা না থাকে। নীহার সন্ধ্যা থেকেই পড়ছে, খুব খাটতে পরে মেয়েটা। ঋতি কয়েকবার টেবিলে বসতে চাইলো। হচ্ছে না। এরিমধ্যে কয়েকবার দরজা বন্ধ করে ঘুমুতে চাইলো। কিন্তু পাশের রুমের বান্ধবী এসে প্রতিবারই ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিলো। ক'বার দরজা বন্ধ করে গান শুনতে চাইলো–না, একদম ভালো লাগছে না আজ। আজ ডাইনিং-এ গেলো না সে। মা খাবার দিয়ে দিয়েছে; তারই কিছুটা মুখে দিলো। মেডিকেলে অধিকরাত অবধি রুমে-রুমে বাতি জ্বলে। কাল আবার ক্লাশ নেই–আজ অনেকেই ঘুমুতে যাবে সেই ভোরবেলা, ঘুমুবে কাল দুপুরতক।

রাত দশটা-এগারটা হবে। হোস্টেলের বারান্দায় পায়চারি করছে ঋতি। আরও পরে, ৩১৪ নম্বর রুমে ঢুকলো। ইভানা রশিদের রুম। ইভানার সঙ্গে একজন জুনিয়র থাকে। ঢুকেই বললো–ইভানা চা খাওয়াতে পারিস। ইভানা দ্রুতই ইলেকট্রিকের জগে পানি বসিয়ে দিয়ে বললো–সঙ্গে হরলিকস খাবি নাকি।

– দে।